সময় এসেছে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের

আলেয়া পারভীন

বাংলাদেশ পুরুষশাসিত সমাজ হওয়ায় নারীদের জীবনপ্রণালিতে কোনো নতুনত্ব নেই। গতানুগতিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে নারী সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। এর কারণ নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। নারীকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখা হয় না। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা নারীকে আদর্শ, কোমলমতি, ভদ্র, নম্র, পতিব্রতী, গৃহলক্ষ্মী হিসেবে দেখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যুগ যুগ ধরে আমাদের সংস্কৃতিতে নারীর প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত থাকার ফলে নারীরা নিজেদের বিকশিত করতে পারে না। এজন্য সকল ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ।

পুরুষশাসিত সমাজ হবার কারণে বাংলাদেশে নারীদের পুরুষদের অধীন হয়ে থাকতে হয়। এখানে পারিবারিক কাঠামোর মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে পুরুষের পদমর্যাদা, যেখানে পুরুষ সর্বদাই শীর্ষে। আর পুরুষ পরিবারের প্রধান হবার কারণে সর্বক্ষেত্রে পুরুষরাই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীদের কোনো মতামত গ্রহণ করা হয় না। যার ফলে নারীরা কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় না। অন্যদিকে পরিবারের মধ্যেই সারাজীবন নারীর অবস্থান নির্ধারিত হয়। পরিবারে নারী বিভিন্নভাবে পরিচিত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে তার অবস্থানগত কারণে পরিচিতির বদল হয়। কখনো কন্যা, কখনো মাতা, কখনো স্ত্রী, কখনো-বা ভগ্নি হিসেবে পরিবারে নারীর অবস্থান বজায় থাকে। জীবনের সবক্ষেত্রেই নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি নারীর আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, সে সর্বদাই পুরুষের অভিভাবকত্বাধীন থাকে। কখনো পিতা, কখনো স্বামী, কখনো পুত্র বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় পুরুষ অভিভাবক হিসেবে সর্বদাই নারীর পাশে অবস্থান করে। আর নারীর এরূপ অবস্থা পরিবারে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের সৃষ্টি করে, যা পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধস্তনতার অন্যতম একটি কারণ।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীর নিম্নমর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হচ্ছে, পুরুষ কর্তৃক পরিবারের খাদ্যসংস্থান ও ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন। যেহেতু পুরুষই পরিবারের সদস্যদের খাদ্যসংস্থান এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় কেনাকাটায় অর্থসংস্থান করে, ফলে বিভিন্ন দিক থেকে পরিবার বা সমাজে নারীর ভূমিকা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন নারীর অবদানকে সেখানে গণ্য করা হয় না। তাই মর্যাদার দিক থেকেও নারীরা পুরুষের চেয়ে বড়ো হতে পারে না। উপরন্তু, সমাজে বিদ্যমান রীতিনীতি, আইন, ধর্ম, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সবকিছুই পুরুষস্বার্থের সহায়ক এবং নারীস্বার্থের পরিপন্থী। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান পারিবারিক কাঠামো ও পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ নারীকে অধস্তনতায় নিপতিত করে। আর সে অধস্তনতাকে স্থায়ী করার জন্য পুনরায় অধস্তনতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়ে থাকে। যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধস্তন এবং পুরুষকে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখতে চায়, কাজেই পুরুষের আধিপত্য সংরক্ষণ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই তৈরি হয় নানা মূল্যবোধ। আর নারীর নিজস্ব সংস্কৃতি এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় আইন, সামাজিক রীতিনীতি ও পরিবারিক নিয়মকানুন দ্বারা বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বিবাহ প্রথা, বৈবাহিক সম্পর্ক, মাতৃত্ব ইত্যাদি পরিচালিত হয়। এ সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিয়েতে মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করে পিতা, ভাই বা পরিবারের অন্য কোনো প্রভাবশালী পুরুষের সম্মতি প্রাধান্য পায়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব, গ্রাম-শহর সর্বত্রই মেয়েদের বিয়ে দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের কর্তাব্যক্তি, অর্থাৎ পুরুষ। ২০১১ সালে কৃত সর্বশেষ বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপের (বিডিএইচএস) তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, দেশে বাল্যবিয়ের হার ৬৬ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার সবচেয়ে বেশি। ফলে এখানে একজন নারী গড়ে ১০ থেকে ১১ বার সন্তানসম্ভবা হয়। তবে এই সন্তানদের ক্ষেত্রে কেবল পুত্রসন্তানের কারণে মায়ের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কেননা আমাদের সমাজে কন্যাসন্তানের চেয়ে

পুত্রসন্তানের মায়েরা অনেক বেশি নিরাপদ। ছেলেশিশুর মায়ের নিরাপত্তা সমাজের অবিবাহিত, বন্ধ্যা, বিপত্নীক কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীর তুলনায় অনেক বেশি।

আইনের দৃষ্টিতে বিয়ের দেনমোহর, বয়সসীমা, রেজিস্ট্রেশন, কাবিননামা, সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি বাধ্যতামূলক হলেও বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীরা অসম। পুরুষের তালাক দেবার, একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখবার, সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রাপ্তির এবং স্ত্রীর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সুযোগ রয়েছে। অথচ নারীর অধিকার রয়েছে কেবল মোহরানা প্রাপ্তির ও ভরণপোষণের। যদিও বাস্তবে নারীর মোহরানা প্রাপ্তির হার নামমাত্র। এক গবেষণায়[১] দেখা গেছে, অধিকাংশ নারীই তাদের মোহরানা কিছুই আদায় করা হয় নি বলে উল্লেখ করেন, যার শতকরা হার ৬৩.৮ ভাগ। সাম্প্রতিক আরেকটি গবেষণায়[২] দেখা যায়, গবেষণা এলাকার নারীদের নগদ (তাৎক্ষণিক) দেনমোহর তাদের স্বামীরা পরিশোধ করেছেন কমই (২৮.৫ শতাংশ)।

নারী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক অর্থাৎ শরীরগত পার্থক্য থাকায় নারীরা সন্তান ধারণ ও লালনপালন কাজে ব্যাপৃত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা নারীর মতো সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয়। নারী প্রজননপ্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিধায় পুরুষরা মনে করে যে, নারীরা পুরুষের ন্যায় কোনো কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে না। তারা (নারীরা) করবে হালকা কাজ অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজ। আর পুরুষরা করবে বাইরের কাজ। পুরুষেরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই কর্মবিভাজন করে, প্রজননে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা থেকে নিস্তার লাভের জন্য পুরুষেরা নারীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আর এভাবেই দৈহিক বা প্রজননগত পার্থক্যের কারণে পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে এবং নারী হয় অধস্তন।

বাংলাদেশের পুরুষগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিক দিক দিয়ে নারীর তুলনায় শক্তিশালী। আর দৈহিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় তারা মনে করেন, সমাজের ধারাবাহিকতা রক্ষায় পিতৃত্ব একান্ত অপরিহার্য, যা নারীর 'মাতৃত্বের' ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, সমাজের ধারাবাহিকতা রক্ষায় পুরুষের তুলনায় নারীর ভূমিকাই বেশি।

আজকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে কোনোরূপ দৈহিক মিলন ছাড়াই শুক্রাণু গ্রহণ করে নারী গর্ভধারণ করে মা হতে পারেন। কিন্তু নারীর ডিম্বাণু নিয়ে পুরুষ তার শুক্রাণুর সহযোগিতায় একাকী বাবা হতে পারেন না। কারণ পুরুষ গর্ভধারণ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে পুরুষের দৈহিকভাবে শক্তিশালী হওয়া তাকে পিতৃত্বের মর্যাদা দিতে পারে না। একমাত্র নারীই পারেন পুরুষকে পিতার মর্যাদা বা স্বীকৃতি দিতে। এক গবেষণায়[৩] দেখা গেছে, সমাজে একটি বিশ্বাস গভীরভাবে প্রোথিত, আর তা হলো আল্লাহ বিবি মরিয়মকে পুরুষ ছাড়াই মা করেছেন। যাতে প্রমাণ হয় যে সন্তানের জন্য মা-ই অধিক প্রয়োজনীয়।

সমাজে মাতৃত্বকে মহান হিসেবে চিহ্নিত করে সন্তান জন্মের পর থেকে তার পরিচর্যার পুরো দায়িত্বই মাকে বহন করতে হয়। আর এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মায়ের জীবনের অনেকটুকু সময়ই এখানে ব্যয় হয়ে যায়। এতে শুধু যে নারীর শিক্ষাজীবন, কর্ম বা চাকরি জীবনই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় তাই নয় বরং এতে মায়েদের স্বাস্থ্যের ওপরও মারাত্মক চাপ পড়ে। অথচ পিতৃত্বের দরুন পুরুষকে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান পরিচর্যায় পুরুষ কোনো ভূমিকা পালন করে না। সন্তান পরিচর্যাকে তারা মেয়েলি কাজ বলে এড়িয়ে যায়। অথচ সন্তান পরিচর্যা কেবল মায়ের দায়িত্ব নয়, বাবারও।

---

[১] হোসাইন, মো. ফারুক, "বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা এবং নিরাপত্তা বিধানে দেনমোহর : প্রেক্ষিত রাজশাহী", *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা ১৩, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৪০।

[২] পারভীন, আলেয়া-এর পিএইচডি গবেষণা "মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারীর অধিকার : বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর সচেতনতা অধ্যয়ন", জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩০১।

[৩] হোসাইন, নাসিম আক্তার কর্তৃক পিএউচডি থিসিসের জন্য ফিল্ডওয়ার্ক করাকালীন গ্রাম থেকে সংগৃহীত, ১৯৯২।

গণমাধ্যম সমাজে নারীর ভূমিকা রূপায়ণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমের বিভিন্ন শাখায় নারীর প্রগতিশীল ভূমিকাকে উপেক্ষা করে তথাকথিত নারীসুলভ আচরণ ও গৃহিণী রূপকে তুলে ধরা হয়, যেখানে নারীকে দেখা যায় গৃহকর্মী, মা, কর্মহীন, পুরুষনির্ভর সত্তা, সৌন্দর্য সামগ্রী, প্রসাধনপ্রিয়, কলহপ্রিয়, গৃহিণী বা স্ত্রী, অনুপ্রেরণাদাত্রী, লজ্জাবতী এবং সংসারসেবী হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীরা প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে রং ফর্সা করার জন্য সদা ব্যস্ত এবং রং ফর্সা না হলে তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই ধরনের বিজ্ঞাপনে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি দেখা যায়, যা তাদের মর্যাদাকে হেয় করে। পাশাপাশি পুরুষ প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনেও নারীকে অবাঞ্ছিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, টক শো ও তথ্যমূলক অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও অনুষ্ঠানের নির্মাতা বা অন্যান্য সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর ভূমিকায় নারীকে কম দেখা যায়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে থাকলেও রিপোর্টিং বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ এখনো কম। এর প্রধান কারণ, নারীকে এ ধরনের কাজে অপারগ বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশনস (বিসিডিজেসি)-এর জরিপ অনুযায়ী ৪৫ শতাংশ নারী সংবাদকর্মী বলেন, পুরুষ সহকর্মীরা তাদের অবজ্ঞা করেন। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে গণমাধ্যমে নারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

সমাজে নারীর অধস্তনতাকে নিশ্চিত করে আইন, বিশেষ করে পারিবারিক আইন। বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে পুরুষের বহুবিবাহ করার অধিকার, স্ত্রীকে একতরফা তালাক দেবার অধিকার, সন্তানের আইনগত অভিভাবকত্ব স্বীকৃত, যা নারীকে অধস্তন করে রেখেছে। এমনকি কাগজে-কলমে থাকলেও নারীরা পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি পান না। এক গবেষণায়[৪] দেখা গেছে, কেবল ১৮.৮ শতাংশ নারী স্বামীর সম্পত্তি পেয়েছেন এবং পিতার সম্পত্তি বাস্তবে পেয়েছেন মাত্র ২১.৪ শতাংশ নারী।

বাংলাদেশে উত্তরাধিকারের রাজনীতি প্রচলিত বিধায় রাজনীতি বা সরকারের শীর্ষপদগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয় মাত্রায় হলেও বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। সাম্প্রতিক এক তথ্য মতে দেখা যায়, রাজনীতি থেকে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে কমছে। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সিনিয়র নেতাদের যৌন হয়রানি, দলীয় শীর্ষ পদে নারী নেতৃত্বের সংস্কৃতি না থাকা, সংগঠনে নারীদের বাড়তি সুবিধা না দেয়া, মেয়েশিক্ষার্থীদের রাজনীতিকে ইতিবাচক হিসেবে তুলে না ধরা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে কেবল নারীরূপে বিবেচনা করা এবং নারীর নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিষয়কে[৫]। নারী যখনই মেধা ও কর্মের মাধ্যমে উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছাতে চান, তখনই তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কাছে পুরুষের এক ধরনের হেরে যাওয়া বলে বিবেচিত হয়। আর এরূপ অবস্থান যাতে তৈরি না হয়, নারী যেন তার মেধা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে না পারেন, সেজন্য যৌন হয়রানির মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার অবতারণা করা হয়। অথচ পুরুষ সহজেই নারীর মেধার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। মেধা ও কর্মের ভিত্তিতে যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে, তারই হবার কথা সুউচ্চ আসনের অধিকারী।

বস্তুত সমাজ রাজনীতিকে 'পুরুষের বিশ্ব' বলে বিবেচনা ও বিশ্বাস করে এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ বলে মনে করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীও এ মূল্যবোধ ধারণ করে এবং জীবনাচরণে তা চর্চা করে। এই পুরুষকেন্দ্রীক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এভাবে পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতিতে নারীকে কোণঠাসা করে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে।

বেগম রোকেয়া থেকে সুফিয়া কামাল পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, সে সময়ে তাঁরা যে বাংলার নারীর স্বীয় মর্যাদা, অধিকার, নারীমুক্তির অবিচ্ছেদ্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তা আজ আমাদের কাছে নারীমুক্তি আন্দোলনের উদাহরণ ও প্রেরণা। কিন্তু দুঃখজনক যে আজো আমাদের দেশের নারীরা পুরুষশাসিত সমাজের কাছে

৪ পারভীন, আলেয়া-এর পিএইচডি গবেষণা "মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারীর অধিকার : বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর সচেতনতা অধ্যয়ন" থেকে প্রাপ্ত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৭৮।
৫ দৈনিক যুগান্তর, ০৮ মার্চ, ২০১৫।

অবহেলিত। সামাজিক পরিবেশের বাধ্যবাধকতা নারীদের উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। নারীর সমঅধিকার ও নারীমুক্তির কথা জোর গলায় বলা হচ্ছে, কিন্তু নারীর অবস্থানে প্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে না। যদিও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীসমাজের অংশগ্রহণও লক্ষণীয়। গার্মেন্টস শিল্পে লক্ষ লক্ষ নারীশ্রমিক কাজ করছে। আবার পরীক্ষার মেধাতালিকায়ও মেয়েদেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তারপরও নারীদের প্রতি সমাজের কেমন যেন একটা অবহেলা বা অবজ্ঞার দৃষ্টি সক্রিয়। তবে সাম্প্রতিককালে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তারা তাদের পদমর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা, পরিবার বা সমাজের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের ফলে সম্প্রতি পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এমনকি অনেক নারী স্বামীর তীব্র আপত্তির মুখেও কন্যাসন্তানদের স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। কাজেই সময় এসেছে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের। এজন্য যা করতে হবে তা হলো চিন্তনবিধিতে পরিবর্তন আনা। নারী-পুরুষ উভয়ের চিন্তনবিধিতে পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য পরিহার করতে হবে সে সকল প্রথাগত বা গতানুগতিক চিন্তা ও অভ্যাসগত ধারণা, যা নারীকে সমাজে অধস্তন রাখে এবং পুরুষকে উর্ধ্বতন করে। চিন্তনবিধিতে একটি বিষয়ই থাকবে আর তা হলো নারী-পুরুষ উভয়েই সমমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। আর এজন্য যা করতে হবে, তা হলো—

- নারীরা নিজেকে নিয়ে ভাববেন, নিজেকে নিয়ে লিখবেন, যাতে তাদের লেখা দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত নেতিবাচক চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড বা বক্তব্য পরিবর্তন করা যায়। সমাজে ইতিবাচক নারী মতাদর্শ তৈরিতে নারীকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষরা হবেন সহযোগী। মনে রাখতে হবে, মর্যাদা বা অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অর্জন করতে হয়।

- নারী গৃহে কাজ করে বলেই পুরুষেরা বাইরে শ্রম দিতে পারেন। তাই নারীরা যখন গৃহের বাইরে শ্রম দেবেন, তখন নারীর সাথে সমন্বয় করে সুযোগ-সুবিধামতো পুরুষকেও গৃহস্থালি কাজে শ্রম দিতে হবে। গৃহস্থালিসহ সকল কর্মে পুরুষের যেমন নারীকে সহযোগিতা করতে হবে, তেমনি পুরুষকে গৃহস্থালি কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে নারীকে।

- সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। পরিবারের সকল সদস্য বিশেষ করে মা-বাবা ছেলে ও মেয়েসন্তানকে সমবিবেচনা করে তাদের দিয়ে একই কাজ করাবেন, একই কাজ শেখাবেন এবং একই খেলনা দিয়ে খেলতে দেবেন। ছোটবেলা থেকেই মেয়েশিশুদের বর্হিমুখী এবং ছেলেশিশুদের গৃহস্থালি কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে কাজ কাজই। সামাজিকভাবে মেয়েলি কাজ বা পুরুষালি কাজ বলে কোনো কাজ নেই। অর্থাৎ কাজের কোনো লিঙ্গান্তর নেই।

- নারীর শ্রমকে অর্থের মানদণ্ডেই বিবেচনা করতে হবে। কারণ যেকোনো শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা হয়। আমাদের ভাবতে হবে এভাবে যে, নারীরা গৃহে শ্রম না দিলে অবশ্যই বাইরে শ্রম দিতেন। আর বাইরের শ্রমে যেহেতু অর্থ উপার্জিত হয়, সেহেতু নারীর গৃহশ্রমকেই বাইরের শ্রম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং গৃহশ্রমকে স্বীকৃতি দিয়ে নারীকে সরকার কর্তৃক অর্থ প্রদান করতে হবে। এমনকি যে সব নারী ঘরে-বাইরে শ্রম দেন, তাদের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকও হবে ভিন্ন। রাষ্ট্র ও সমাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে নারীর গৃহস্থালি কাজের অবদানকে জিডিপিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অতি জরুরি।

- পুরুষের দৈহিকভাবে শক্তিশালী হওয়া বা নারীর দৈহিকভাবে কম শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। এর কারণ তাদের মধ্যকার এই পার্থক্য প্রাকৃতিক। কাজেই নারী-পুরুষের দেহকে কম বা বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়।

- সমাজে নারীসংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মীয় বাণীর অপব্যবহার রোধ করতে হবে। বিশেষ করে যে সকল ভুল হাদিস (স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত, পুরুষের ৭টি পর্যন্ত বিয়ে জায়েজ, প্রভৃতি) সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যা

পুরুষতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং নারীকে অবদমিত বা অধস্তন করে রাখে সে সব ভুল হাদিসকে চিহ্নিত করে তার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন এবং মানবিক অধিকার রক্ষায় জ্ঞানচর্চা আবশ্যক। কেননা জ্ঞান উন্মেষের ফলে আত্মার বিস্তৃতি নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে সহায়তা করে। তাই প্রতিটি মহল্লায় একটি করে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত পাঠাগার বাধ্যতামূলকভাবে স্থাপন করা উচিত, যেখানে নারী-পুরুষের মানবিক হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাওয়া যায়।

- দেশের সকল নাগরিক একই শিক্ষাব্যবস্থাধীনে একই মানসিকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড়ো হলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব (নারী অবলা, নারীর বুদ্ধি কম, নারী ঘরের শোভা, নারীর কাজ কেবল সন্তান জন্মদান ও তাদের লালনপালন করা, প্রভৃতি) দূর হবে, যা নৈতিক ও সমতামূলক সমাজ গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সচেতনমূলক পাঠ বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যা সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি নারী-পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে এবং নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষ উভয়ের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনন গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

- বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো গণমাধ্যমে নারীর ভূমিকার ইতিবাচক রূপায়ণে ব্যাপক ভূমিকা রাখা এবং এজন্য প্রথমত নারীকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে তিনি যেখানে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছেন সেখানে যেন শুধু তার রূপ নয় বরং মেধা ও কর্ম গুরুত্ব পায়। এতে নারীর মর্যাদার বিস্তার ঘটবে। দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যমসমূহের জেন্ডারবান্ধব নীতিমালা থাকা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

- সমাজে পারিবারিক আইন দ্বারা নারীর যে অধস্তনতা নিশ্চিত হয় তা দূর করার জন্য নারীদেরই সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন নারীসহ সকল মহলের সম্মিলিত প্রয়াস।

- রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে নারীদের পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এক্ষেত্রে নারীকেও উদ্যোগী হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো যথেষ্ট পরিমাণে ইতিবাচক নয়, কাজেই এটা বলা যায় যে, নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিন্তনবিধিতে পরিবর্তন আনা অত্যাবশ্যক। পুরুষের ন্যায় নারীর নিজস্ব পরিচিতির বিস্তারে ও সমতামূলক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে।

আলেয়া পারভীন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। aleya.perveen@yahoo.com